☑ বাংলা সাহিত্য: প্রাচীন যুগ
☑ প্রাচীন যুগ:
বিগত বছরের বিসিএস প্রশ্নাবলি

- বাংলা ও বাঙালি জাতি
- বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ
- বাংলা লিপি
- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ
- চর্যাপদ
- ডাক ও খনার বচন

আলোচ্য বিষয়

বাংলা সাহিত্য | প্রাচীন যুগ: চর্যাপদ

BCS প্রশ্নাবলী

০১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়? (৩৮তম BCS)
০২) অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেন। (৩৭ তম BCS)
০৩) চর্যাপদে নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন। (৩৬তম BCS)
০৪) চর্যাপদের ভাষা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন। (৩৫তম BCS)
০৫) বাংলা লিপির উৎস কী? (৩৪তম BCS)
০৬) বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিত্বশীল চারটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম লিখুন । (৩৪তম BCS)
০৭) চর্যাপদ কত সালে এবং কোন স্থানে থেকে উদ্ধার করা হয়? / চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?/চর্যাপদ আবিষ্কারের বৃত্তান্ত লিখুন। (৩৪, ৩৩, ২৮ ও ২৭তম BCS)
০৮) সন্ধাভাষা কী? এ ভাষার কোনো সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংক্ষেপে লিখুন। (৩২তম BCS)
০৯) চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির পরিচয় দিল। (৩১তম BCS)
১০) চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দিন। কাহ্নাপা কে ছিলেন? (৩০, ২৪, ১৩ ও ১০তম BCS)
১১) চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা দিন। (২৯তম BCS)
১২) ডাক ও খনার বচনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। (২৯তম BCS)
১৩) চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে আবিষ্কারকের অভিমত দিন। (২৮তম BCS)
১৪) বাংলা সাহিত্যের প্রচীনতম নিদর্শন কী?/বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যের নাম কী? (২৭, ২১, ১৭তম BCS)
১৫) চর্যাপদ কী? (২৪ ও ২০তম BCS)

আলোচ্য বিষয়

বাংলা সাহিত্য : প্রাচীন যুগ

- বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ
- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ
- চর্যাপদ

STUDENT STUDY

বাংলা সাহিত্য : প্রাচীন যুগ

বাংলা নামের উৎপত্তি

দেশবাচক নাম হিসেবে বাংলার ব্যবহার মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিকে প্রচলিত হয়। সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ 'সুবহ-ই-বঙ্গালহ' নামে পরিচিত হয়েছিল। ফারসি 'বঙ্গালহ' শব্দ থেকে পর্তুগিজ Bengala এবং ইংরেজি Bengal শব্দ এসেছে। লক্ষ্মণ সেনের আমলে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহই ছিল বঙ্গ। ইবনে বতুতা প্রথম মধ্যযুগে 'বঙ্গাল' নাম উচ্চারণ করেন। তখন বঙ্গবাসীই ছিল বঙ্গাল। 'সুবেহ বাঙ্গালা'ই শেষাবধি সব অঞ্চলকে বঙ্গ বা বাংলার নামের মধ্যে বিলুপ্ত করে দেয়।

বাংলায় পাঠান যুগের পূর্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' এবং পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' এই দুই নামে চিহ্নিত হত। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও পশ্চিমবঙ্গ 'গৌড়' এবং পূর্ববঙ্গ 'বঙ্গ' এই দুই নামে চিহ্নিত হয়েছে।

বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে মনে করা হয়, যে অঞ্চলে 'বং' গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করত, তারাই এ নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'বঙ্গ' শব্দ 'বং' বা 'বঙ' গোষ্ঠীর নাম। 'বং' গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বাসভূমি ছিল ভাগীরথী নদীর পূর্বতীর থেকে আসামের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত।

মোগল সম্রাট আকবরের সভাসদ বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেশবাচক 'বাংলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি এর উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এ দেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে বাঁধ বা জমির সীমাবাচক 'আল' (আলি, আইল) প্রত্যয়যোগে 'বাংলা' শব্দ গঠিত হয়েছে। আবুল ফজলের মতে, চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (রাজমহল) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। এখানকার প্রাচীন রাজারা দশ গজ উঁচু ও বিশ গজ প্রশস্ত আল বা বাঁধ নির্মাণ করতেন।

বাঙালি জাতি

বর্তমান বাঙালি জনগোষ্ঠী বহুকাল ধরে নানা জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এর মূল কাঠামো সৃষ্টির কাল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করা যায়: ক. প্রাক-আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী এবং খ. আর্য নরগোষ্ঠী। এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদেরই বসতি ছিল। এই প্রাক-আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালি জীবনের মেরুদন্ড। আর্যদের আগমনে সে জীবন উৎকর্ষমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতায় উন্নততর বলে তারা অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে। অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে আর্যপূর্ব বাঙালি জনগোষ্ঠী। এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙালি জাতির মধ্যে প্রবহমান।

অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহ চলেছিল, তার সঙ্গে আর্য জাতি এসে সংযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতি। এ জন্য প্রাক-আর্য আদিম জাতি বাঙালি জনসাধারণের তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করে রয়েছে। বাংলা ভাষা ও গ্রামীণ জীবনে এদের স্পষ্ট প্রভাব থাকলেও বাংলাদেশে আর্য অভিযানের পর অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী আর্য ভাষা ও জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেছে। অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর জনসমষ্টির সংমিশ্রণ ঘটে। বাংলাদেশে আর্যীকরণের পরেই এদের আগমন ঘটে বলে বাঙালির রক্তের সঙ্গে এদের মিশ্রণ উল্লেখযোগ্য নয়, বাংলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এদের অস্তিত্ব রয়েছে। গারো, কোচ, ত্রিপুরা, চাকমা ইত্যাদি উপজাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত।

মৌর্যবিজয় থেকে গুপ্তবংশের অধিকার পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে মোট আট শ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমে ক্রমে আর্যীকরণের পালা চলে। তবে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তযুগেই বাংলাদেশে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হয়। আর্যরা ব্রহ্মবর্ত ত্যাগ করে প্রথমে আর্যাবর্তে বা উত্তর ভারতে আগমন করে এবং পরে মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কলিঙ্গ, রাঢ়, বঙ্গে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে সেমীয় গোত্রের আরবীয়রা ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়। তাদের অনুসরণে নেগ্রিটো রক্তবাহী হাবশিরাও এদেশে আসে। এদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই মুসলিম বণিক ও ধর্মপ্রচারক এদেশে আগমন করেন। মুসলমান শাসনামলে বহু তুর্কি, আরবীয়রা, ইরানি, হাবশি, আফগান ও মোগল মুসলমান বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন।

গুপ্ত-পূর্ব যুগের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে প্রাচীন-গ্রন্থে কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতির উল্লেখ থেকে তাদের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের কথা জানা যায়। গ্রীক লেখকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় সে যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগেই বাংলায় রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। মৌর্যযুগে বাংলার শাসনপদ্ধতি সম্পর্কেও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে গুপ্তযুগে বাংলায় শাসনপদ্ধতির সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। বাংলার কিছুটা অংশ গুপ্ত শাসকদের অধীনে ছিল, বাকিটা ছিল সামন্তরাজাদের শাসনাধীন। পরে লাল রাজারা চারশ বছর বাংলার ওপর শাসন ক্ষমতা বিস্তার করে রাখেন। পালদের শাসন পদ্ধতি পরবর্তীকালে চন্দ্র, বর্মণ, কম্বোজ ও সেন রাজারা অনুসরণ করেন। এভাবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের আগে থেকেই বাংলাদেশে একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীন বাংলার এই পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সমৃদ্ধি ঘটে। আর্যদের আগমনে এদেশে আর্যদের ভাষাই প্রাধান্য পায়। হিন্দু শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছিল। পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধসাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সেনযুগে ছিল সংস্কৃতের প্রাধান্য। প্রাচীন যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ছিল কৃষিনির্ভর। তবে শিল্পও বিকাশ লাভ করে। এই সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

পণ্ডিতগণ বিশ্বের প্রচলিত এবং লুপ্ত ভাষাগুলোর ইতিহাস বিচার করে তাদেরকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রতিটি শ্রেণিতে অনেকগুলো ভাষা, এদের বলে ভাষা-বংশ বা ভাষাগোষ্ঠী। এমনই একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মধ্য এশিয়ায় এ ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একদল ভারতে প্রবেশ করে। তাঁদের ভাষা 'আর্য' (noble) ভাষারূপে পরিচিত ছিল।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকেই আর্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। সঙ্গে ছিল তাঁদের শক্তিশালী বৈদিক ভাষা ও দেবগীতিমূলক সাহিত্য। ধীরে ধীরে তাঁরা ভারতবর্ষের বহুস্থানে ছড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে তাঁরা আর্যভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

'প্রাকৃত ভাষা' কথাটির তাৎপর্য হলো প্রকৃতির অর্থাৎ জনগণের কথ্য ও বোধ্য ভাষা। পরবর্তীকালে এই প্রাকৃত ভাষা ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রভাবে, কথ্য ভাষার উচ্চারণের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করল। প্রাকৃত ভাষা আঞ্চলিক বিভিন্নতা নিয়ে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হলো। যেমন, 'মাগধি প্রাকৃত', 'মাহারাষ্ট্রি প্রাকৃত', 'শৌরসেনি প্রাকৃত', 'পৈশাচি প্রাকৃত' ইত্যাদি। মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ (বা অবহট্‌ঠ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে) থেকেই কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি লাভ করে বাংলা ভাষা।

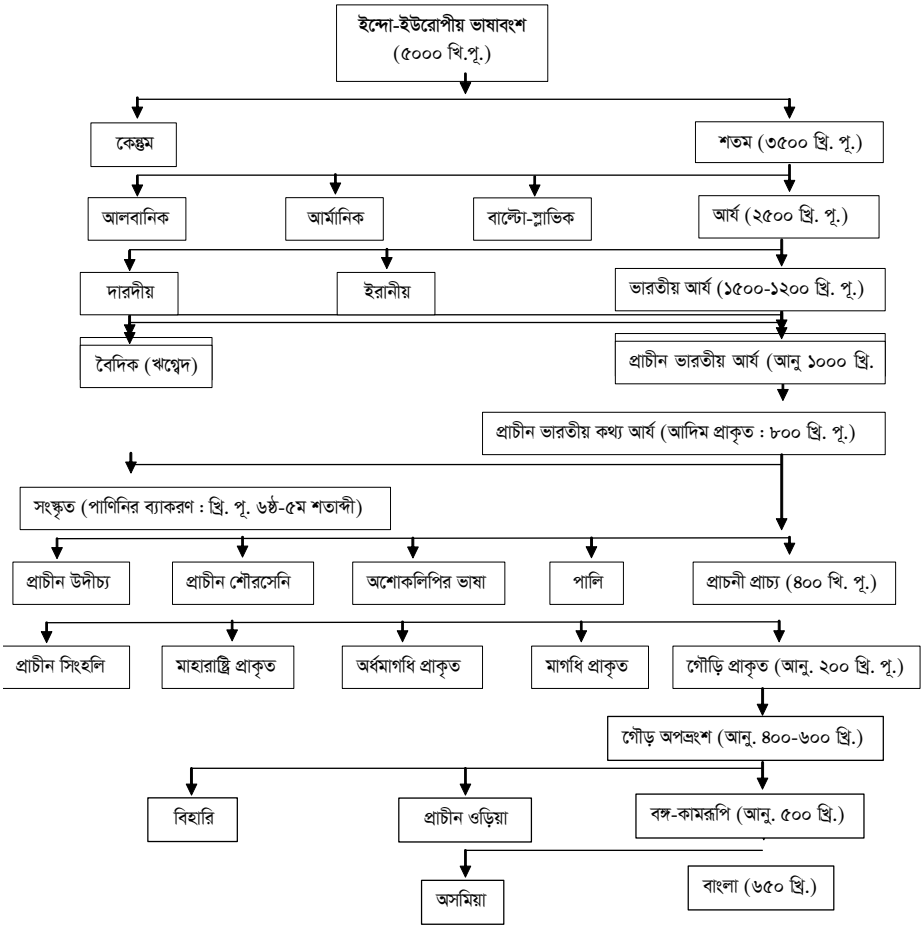

বাংলা লিপি

বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উৎপন্ন। শুধু বাংলা নয় সকল ভারতীয় লিপিই এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে জন্ম লাভ করেছে। ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি। সিংহলী, ব্রাহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী ও তিব্বতি লিপির উৎস ও ব্রাহ্মী লিপি। সম্রাট অশোকের অনুশাসন সুগঠিত ব্রাহ্মী লিপিতেই উৎকীর্ণ। ব্রাহ্মী লিপির সমসাময়িক কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মী লিপি সে স্থান অধিকার করে।

অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি- এই তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে মধ্যভারতীয় ও পূর্বী লিপির এবং দক্ষিণী ব্রাহ্মী লিপি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপির উদ্ভব হয়েছে। পূর্বী লিপি থেকেই বাংলার জন্ম। নাগরী লিপি বাংলা অক্ষরের চেয়ে পুরানো নয়। উত্তর-পশ্চিমা লিপি ষষ্ঠ শতক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লিপিকে স্থানচ্যুত করে। তবে সপ্তম শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পূর্বী লিপি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরী লিপি পূর্বভারতে কিছুকাল প্রাধান্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু পূর্ব ভারতে পূর্বী লিপি অক্ষত থাকে এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যেই এই পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে।

সেন যুগে বাংলা লিপির গঠনকার্য শুরু হলেও পাঠান যুগে মোটামুটি স্থায়ী আকার লাভ করে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে হাতে লেখা হয়েছে বলে বাংলা লিপি নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। ছাপাখানার প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা লিপির তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। উড়িয়া, মৈথিলি ও আসামি লিপির ওপর বাংলা লিপির প্রভাব বিদ্যমান। আসামি ও বাংলা অক্ষরের মধ্যে গুটিকয়েকে অক্ষর ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও, ব্রাহ্মী লিপির কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি।

বাংলা বর্ণমালা গড়ে উঠেছে এগারটি স্বরবর্ণ এবং উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে। সাকুল্যে এই পঞ্চাশটি বর্ণের সাহায্যে সৃষ্টি হয়েছে সোয়া লক্ষের মতো শব্দের যার পঞ্চাশ হাজার তৎসম শব্দ, আড়াই হাজার আরবি-ফারসি, হাজার খানেক ইংরেজি, দেড় শ পর্তুগিজ-ফরাসি, আর কিছু শব্দ বিদেশী, বাদবাকি শব্দ তদ্ভব ও দেশী।

সাহিত্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য

Literature is the criticism of life সাহিত্য হচ্ছে জীবন সমালোচনা। যে কথাগুলো মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে, যা অর্থপূর্ণ এবং যা শ্রোতার মনে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় তাই সাহিত্য।

সাহিত্য মানুষের জীবনে দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক পরিবেশ ফুটে ওঠে। তাই এটি একটি জাতির ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার বিকাশ ঘটায়। প্রেম-ভালোবাসা, ত্যাগ, যুদ্ধ, হিংসা, জয়-পরাজয়, ব্যক্তিত্ব, নীতি-নীতিহীনতা, উদারতা, ক্ষমা সবই সাহিত্যের বিষয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে- 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (ড. সুকুমার সেন), 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' (ওয়াকিল আহমেদ), 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গোপাল হালদার), 'লাল নীল দীপাবলী' (হুমায়ন আজাদ) এবং 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (ভূদেব চৌধুরী)।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

চর্যাপদের সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক- এই তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাচীন যুদ ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্যযুগ ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং আধুনিক যুগ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কারও কারও মতে ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেড়শ বছর 'অন্ধকার যুগ' । আধুনিক যুগকে দু ভাগে ভাগ করা যায়: ১৮০০ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়।

↘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যে যুগবিভাগ করেছেন তা এরকম:

ক. প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুদ (৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)
খ. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০)
গ. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০)
ঘ. অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০), চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণবসাহিত্য যুগ (১৫০০-১৭০০) ও নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০) এবং
ঙ. আধুনিক বা ইংরেজি যুগ (১৮০০ থেকে)।

↘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মধ্যযুগকে ভাগ করেছেন এভাবে:

ক. পাঠান আমল (১২০১-১৫৭৬) এবং
খ. মোগল আমল (১৫৭৭-১৮০০)

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন: চর্যাপদ

চর্যাপদ

চর্যাপদের পুঁথিটি যে রূপে পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায়, এটি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বিভিন্ন কবির রচিত কবিতা-সমষ্টির সংকলন। কবিতাগুলোর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে যে দুর্বোধ্যতা ছিল তা দূর করার জন্য মুনিদদত্ত পদগুলোকে একত্রিত করে সংস্কৃত ভাষায় পদগুলোর সহজবোধ্য টীকা রচনা করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা অন্বিত হয়েছে। পুথিটি খণ্ডিত ছিল বলে টীকাকারের নাম পাওয়া যায়নি। পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী একই সংকলনের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং তাতে টীকাকার হিসেবে মুনিদত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত পুথিটি মুনিদত্তের মূল সংকলন গ্রন্থ নয়- এটি ছিল অনুলিটি অথবা অনুলিপির অনুলিপি।

চর্যাপদ আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আদি স্তরের লক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে পালযুগের সাধারণ বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় এতে রূপলাভ করেছে। চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন বলে বিবেচিত হওয়ায় প্রাচীন বাঙালির জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধন ঘটেছে। চর্যাপদ সদ্য নির্মীয়মান বাংলা ভাষার নিদর্শন। এর রচয়িতাগণ দুরূহ ধর্মতত্ত্বকে সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন। আর সেই সঙ্গে রেখেছেন কবিত্ব শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে একান্নটি গান ছিল। তার মধ্যে একটি (১১ সংখক) পদ টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়নি। আবার পুথির কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ (২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক) পদ এবং একটি (২৩ সংখ্যক) পদের শেষাংশ পাওয়া যায়নি। তাই পুঁথিতে সর্বসমেত সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে।

চর্যাপদের প্রাপ্ত পুথিটির লিপিকাল বার বা চৌদ্দ থেকে ষোলো শতকের মধ্যে বলে অনুমান করা হয়। তবে ১১৯৯ সালে লিপিকৃত 'পঞ্চাকার' নামের পুথির লিপির সঙ্গে চর্যাপদের লিপির সাদৃশ্য বিবেচনা করে কেউ কেউ এর লিপিকাল বার শতক বলে মনে করেন। চর্যার পুথিটি বঙ্গাক্ষরে লিপিকৃত।

আবিষ্কার

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদের প্রায় সমসাময়িক কালে বাংলাদেশে যে সব সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ উপকরণ নয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদগুলো সম্পর্কে ১৯০৭ সালের পূর্বে কোনো তথ্যই জানা ছিল না। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature in Nepal গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করে যে কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিলেন তাতে উদ্দীপ্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে ১৯০৭ সালে সে সাহিত্যের কতকগুলো পদ আবিষ্কার করেন। তাঁর সম্পাদনায় "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" থেকে সেসব পদ ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব এ চারটি পুঁথি একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে একমাত্র চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ই প্রাচীন বাংলায় লেখা; অন্য তিনটি বাংলায় নয়, অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ১৯২৬ সালে এগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন। ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন। ১৯৩৮ সালে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক চর্যার তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

নামকরণ

চর্যাপদের প্রাপ্ত পুঁথিতে উল্লেখকৃত সংস্কৃত টীকাকার মুনিদত্তের মতানুসারে এই পদসংগ্রহের নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়'। নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিতে পদগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। এ দুটি নাম মিলিয়ে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামের পরিকল্পনা করেন। সে আমলে শত শত চর্যাগীতি রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। মুনিদত্তের মতো অনেকেই বিভিন্ন চর্যাগীতির টীকা রচনা করেছিলেন। কীর্তিচন্দ্র মুনিদত্তের টীকার তিব্বতি অনুবাদ করেছিলেন 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' নামে। এতে মনে হয় মূল সংকলনের নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। আধুনিক পণ্ডিতগণের অনুমান যে পুঁথিটির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ' এবং এর সংস্কৃত টীকার নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'।

রচনাকাল

চর্যাপদের সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা মতৈক্যে পৌঁছতে পারেননি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৬৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চর্যাপদের কাল ধরেছেন। অন্যদিকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে চর্যাপদের কাল ধরেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথকে প্রথম বাঙালি কবি মনে করে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, তিনি সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, চতুর্দশ শতকের শেষভাগে রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা অপেক্ষা চর্যার ভাষা দেড় শ বছরের প্রাচীন। তাঁর মতে, ভাষাতত্ত্বের বিচারে চর্যাপদের অনেকগুলো পদ দ্বাদশ শতকে রচিত।

গোরোক্ষনাথ ও কাহ্ন পাদের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ধরে ড. সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যার কাল ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

চর্যাপদের পদ সংখ্যা

চর্যার প্রাপ্ত পুঁথিতে ৫১টি পদ/গান ছিল। তবে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ। ২৪ (কাহ্নপা), ২৫ (তন্ত্রীপা) ও ৪৮ (কুক্কুরীপা) নং পদ এবং ২৩ নং পদের শেষাংশ পাওয়া যায়নি। প্রতিটি পদের লাইন সংখ্যা ১০টি (তবে ২১ নং পদে ৮ টি এবং ৪৩ নং পদে লাইন ১২ টি)।

চর্যাপদের পদকর্তা

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের কবির সংখ্যা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন পদকর্তার কথা বলেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুডডিস্ট মিস্টিক সাঙ্স' গ্রন্থে ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তবে ২৪ জনের পক্ষেই অধিকাংশ পণ্ডিত মত দিয়েছেন। চর্যাপদের পদকর্তাগণ হলেন:

১. আর্যদেবপা, ২. কঙ্কণপা, ৩, কম্বলাম্বরপা, ৪. কাহ্নপা, ৫. কুক্কুরীপা, ৬. গুণ্ডরীপা, ৭. চাটিলপা, ৮. জয়নন্দিপা, ৯. ডোম্বীপা, ১০. ঢেণ্ঢন্পা, ১১. তন্ত্রীপা, ১২. তাড়কপা, ১৩. দারিকপা, ১৪, ধামপা, ১৫. বিরূপপা, ১৬. বীণাপা, ১৭. ভাদ্রপা, ১৮. ভুসুকুপা, ১৯. মহীধরপা, ২০. লুইপা, ২১. লাড়ীডোম্বীপা, ২২. শবরপা, ২৩, শান্তিপা, ২৪. সরহপা।

এ সব নামের কতকগুলো ছদ্মনাম। যেমন : কুক্কুরী, ডোম্বী, শবর, তাড়ক, কঙ্কণ, তন্ত্রী। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি থেকে তাঁরা এসেছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে অনেকে গার্হস্থ্য আশ্রমের সঙ্গে পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করেছিলেন। বৌদ্ধ সহজযানী ও বজ্রযানী আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে খ্যাত ছিলেন। চর্যাগীতিকার প্রায় পদকারই বৌদ্ধ চৌরাশি সিদ্ধার অন্তর্গত। চর্যাকারদের মধ্যে লুই, কুক্কুরীপা, বিরুআ, ডোম্বী, শবর, ধাম, জয়নন্দি ছিলেন বাঙালি। ভাষাবিচারে আরও কেউ কেউ বাঙালি হতে পারেন। তবে কয়েকজন অবাঙালিও ছিলেন। চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ আছে কাহ্নপাদের, সংখ্যায় তেরটি। তাছাড়া ভুসুকুর আট, সরহের চার, লুই, শান্তি, শবরের দুটি করে, অন্যদের একটি করে পদ বিদ্যমান। অনেকের মতে, আদি চর্যাকার লুইপা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মতে, প্রাচীনতম চর্যাকার শবরী এবং আধুনিকতম সরহ অথবা ভুসুকু।

কাহ্নপা

চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে সর্বাধিক পদরচয়িতার গৌরবের অধিকারী কাহ্নপাদ। তাঁর তেরটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এই সংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে কবি ও সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা যায়। কানুপা কৃষ্ণপাদ ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত।

খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে কানুপার আবির্ভাব হয়েছিল বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন। কানুপার বাড়ি ছিল উড়িষ্যায়, তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। রাহুল সংকৃত্যায়ন কাহ্নপা বা কৃষ্ণপাদ বা কৃষ্ণাচার্যপাদ বা কৃষ্ণবজ্রপাদকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। তিনি দেব পালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবৎকালের ঊর্ধ্বসীমা ৮৪০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি বর্ণে ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষু ও সিদ্ধ। তিনি পণ্ডিত-ভিক্ষু নামে খ্যাত ছিলেন। চর্যাপদ ছাড়াও তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেছিলেন।

ভুসুকুপা

চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হলেন ভুসুকুপা। তাঁর রচিত আটটি পদ চর্যাপদ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। নানা কিংবদন্তি বিচারে ভুসুকু নামটিকে ছদ্মনাম বলে মনে করা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম শান্তিদেব। তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন এবং শেষ জীবনে এই বৌদ্ধ ভিক্ষু নালন্দায় নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে শান্তিদেব ভুসুকু সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়ন মতে ভুসুকুর জীবৎকালের শেষ সীমা ৮০০ খ্রিস্টাব্দ। ধর্মপালের রাজত্বকালে (৭৭০-৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) ভুসুকু জীবিত ছিলেন। তিনি রাউত বা অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন। পরে ভিক্ষু ও সিদ্ধ হন। 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী।' - ভুসুকুর এই উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ মনে করে তাঁকে বাঙালি অনুমান করা হয়।

লুইপা

চর্যাপদের প্রথম কবিতা লুইপার লেখা। কবিতাটি এরকম:

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমান।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥

সাধারণত লুইপাকে আদি সিদ্ধাচার্য বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও রাহুল সংকৃত্যায়ন তাঁকে প্রথম বলে স্বীকার করেন না। লুইপা বাঙালি বলে অনুমিত। উড়িষ্যায় তাঁর জন্মস্থান বলে কারও কারও ধারণা। লুইপার জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ। সংস্কৃত ভাষায় তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থের নাম 'অভিসময়বিভঙ্গ।

শবরপা

শবরপা ছিলেন বাঙালি এবং পেশায় ছিলেন ব্যাধ। ড. শহীদুল্লাহ্‌র মতে, শবরপা ৬৮০ থেকে ৭৩২ সালে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, শবরপা ছিলেন বিক্রয়শীলা নিবাসী, কুলে ক্ষত্রিয় এবং অন্যতম সিদ্ধা। তিনি ৮৮০ সালের দিকে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। ড. সুকুমার সেনের মতে, লুইপার গুরু শবরপার জীবৎকাল আট শতকের প্রথমার্ধ।

কুক্কুরীপা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, কুক্কুরীপা বাংলাদেশের লোক। তিনি আট শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সংস্কৃত্যায়নের মতে, কুক্কুরীপা দেবপালের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উচ্চতম সীমা ৮৪০ সাল। তাঁর জন্মস্থান কপিলাবস্তু। তাঁর জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ বংশে। তিনি ছিলেন অন্যতম সিদ্ধা। তারানাথের মতে, একটি কুক্কুরী সর্বদা সঙ্গে রাখতেন বলে এই সিদ্ধা কুক্কুরীপা নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

চর্যাপদের আলোচকগণ

১৯০৭ সালের চর্যাপদ আবিষ্কারের পর থেকে অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। চর্যাপদের আবিষ্কর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৯১৬ সালে চর্যাগীতি প্রকাশ করে তিনি একে বাংলা ভাষার প্রথম অবস্থার রচনা বলে যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন তা পরবর্তীকালের গবেষকগণ মেনে নিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে প্রকাশিত দুটি দোহাকোষ ও একটি ডাকার্ণব।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "১৯০৭ সালে আবার নেপালে গিয়া আমি কয়েকখানি পুঁথি দেখিতে পাইলাম। একখানির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', উহাতে কতকগুলি কীর্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো, গানের নাম চর্যাপদ।" এখান থেকেই চর্যাপদের অলোচনা পর্যালোচনার শুরু। বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে প্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। চর্যাগীতির বৈষাকরণ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ভাষা আলোচনা করে দেখালেন 'চর্যাপদ বাংলা নিশ্চয়ই, বাংলার প্রায় মূর্তি- অবহটঠের সধ্যানির্মোক মুক্ত রূপ।' ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার এবং ১৯৩৮ সালে তা প্রকাশ করে চর্যার জট উন্মোচন করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন এবং ১৯৪২ সালে চর্যাপদের সঠিক পাঠ নির্ণয় করে আলোচনার পথ আরও সহজ করেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সালে চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। বিহারের প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য, বৌদ্ধ সহজযান ও চর্যাগীতিকা নিয়ে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রচুর গবেষণা করেছেন। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় চর্যাপদ থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ এবং বাক্যগঠনরীতির স্বরূপ দৃষ্টান্তযোগে দেখিয়েছেন। এসব আলোচনার ফলে দেশে ও দেশের বাইরে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বলে চর্যাপদের আলোচনা ক্রমেই বাড়ছে।

চর্যাপদের ভাষা

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা। ভাষার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা স্বকীয় মূর্তি সম্পূর্ণ রূপে পরিগ্রহ করতে পারেনি। চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা বলে তখনকার ভাষার প্রাচীনত্বের দরুন গৌড় অপভ্রংশের প্রভাব এতে রয়ে গেছে। ফলে কেউ কেউ অপভ্রংশ, প্রাচীন হিন্দি, মৈথিলি, উড়িয়া বা আসামি ভাষা বলে দাবি করেন। একই গোষ্ঠীজাত বলে এ সব নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার মিল আছে। চর্যাকারেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সকলের ভাষা একরূপ হতে পারে না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, শান্তি পাদের ভাষা মৈথিলি এবং কাহ্ন, সরহ, ভুসুক প্রমুখের ভাষা প্রাচীন বাংলা বঙ্গকামরূপী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, চর্যার পদসংকলনটি আদিতম বাংলা ভাষায় রচিত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী মনে করেন চর্যাপদ বার শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। এ সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষা তার স্বকীয় মর্যাদা লাভ করেনি। তের শতকের পরে উড়িয়া ভাষা এবং ষোলো শতকের পরে আসামি ভাষা বাংলা ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে চর্যাপদের ওপর কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ কোনো ভাষার দাবি স্বীকার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে চর্যাপদের ভাষা অবহট্‌ঠ বা লেখ্য প্রত্নবাংলা উড়িয়া-মৈথিলি-আসামির অভিন্ন জননীস্বরূপ বলে মানতে হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, সেকালের বাংলা, আসামি ও উড়িয়া ভাষায় পার্থক্য ছিল সামান্যই।

চর্যাপদের ভাষার বৈশিষ্ট্য

চর্যাপদের ভাষা বাংলা বলে প্রমাণিত হলেও তাতে অপভ্রংশের কিছু কিছু নিদর্শন আছে। চর্যাপদ যে সময়ের রচনা তখন বাংলা ভাষা তার পূর্ববর্তী স্তর অপভ্রংশ থেকে নিজস্ব রূপ গ্রহণ করলেও একেবারে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েনি। চর্যাকারেরা অনেকেই অপভ্রংশে পদ রচনা করেছেন। তাঁদের বাংলা রচনাতে তাই প্রাকৃত বা অপভ্রংশের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

↘ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণগত যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নরূপ :

ক. চর্যাপদের ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগত বিশেষত্ব আধুনিক বাংলার ধ্বনির মতো। সংস্কৃত শব্দের বানানে সর্বত্র এক নিয়ম পালন করা হয়নি।

খ. বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ আধুনিক বাংলার মতো চর্যাপদেও দেখা যায় না। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে কোনো নিয়ম ছিল না। যেমন- পঞ্চ-পাঞ্চ।

গ. চর্যাপদে শ, ষ, স- তিনটি বর্ণের পার্থক্য ছিল না। যেমন- সবর, শবর, ষবরালী। তেমনি জ, য এবং ন, ণ- এদের মধ্যেও পার্থক্য নেই।

ঘ. চর্যায় অ-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি বিদ্যমান ছিল।

ঙ. চর্যাপদের ভাষায় অপভ্রংশের প্রভাবে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হত। তবে ক্লীবলিঙ্গ নেই। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হলে বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গ হত। যেমন- নিশি অন্ধারী মুষার চারা। 'ইল' প্রত্যয়ান্ত বা 'এর' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ কখনও কখনও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিয়েছে। যেমন- 'সোণে ভরিলী করুণা নাবী', 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহেরি কুড়িআ', 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী'। ঈ বা আ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হত। যেমন- হরিণী, শবরী ও হরিণা।

চ. চর্যাপদের ভাষায় শব্দরূপের গঠনে একবচন ও বহুবচনের তফাত নেই। সম্বন্ধ বোঝানো ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গেও পার্থক্য দেখা যায় না।

ছ. একবচনে কর্তৃ, কর্ম, করণ ও অধিকরণ কারকে কোনো বিভক্তি ব্যবহৃত হত না। যেমন- সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগই।

সন্ধ্যাভাষা

চর্যাপদের ভাষাকে কেউ কেউ সন্ধ্যাভাষা বা সান্ধ্যভাষা বলেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। যাহারা সাধন-ভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নেই।' এ কারণে চর্যার ভাষা সন্ধ্যাভাষা।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার গূঢ় তত্ত্ব যাতে অন্য ধর্মের লোকেরা বুঝতে না পারে এর জন্য স্থূল অর্থযুক্ত প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- আলি-কালি, ডোম্বী, শবরী, হরিণী, চন্দ্র-সূর্য, গঙ্গা-যমুনা, শাশুড়ী-ননদী ইত্যাদি। এ সব শব্দের মাধ্যমে সাধনগত রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত প্রকাশ পাচ্ছে। ভাষার দুর্বোধ্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে বৌদ্ধ বজ্রযানী সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়ের গোপন সাধনপ্রণালীর ইঙ্গিত।

চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব

সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের যথার্থ মর্যাদা কাব্যসৃষ্টি হিসেবে। তবে তার মধ্যে একটি ধর্মতত্ত্ব চমৎকারভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতির নিগূঢ় রহস্য রূপায়ণের সময় সত্যিকারের কবি হয়ে উঠেছিলেন। তাই চর্যাপদে কবিতার লক্ষণ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ধর্মের তত্ত্বকথাও বিধৃত হয়েছে।

চর্যাপদের কতগুলোর বিষয় সোজাসুজি আধ্যাত্মিক। তাতে জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের দোলা থেকে মুক্তি লাভের এবং সহজ অবস্থার রূপ সহাসুখনিবাসে পৌঁছানো ঠিকানা আছে। পরমার্থ সত্য উপলব্ধির জন্য গুরুর নির্দেশ বিদ্যমান কতগুলো চর্যায় বাহ্য অর্থের অবগুণ্ঠনে তত্ত্ব-উপদেশ ও সাধনার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অনেক শব্দের সাধারণ অর্থের বাইরে সিদ্ধাচার্যদের পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। চর্যাপদের মাধ্যমে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা গোপন তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্চাকে বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা কালক্রমে যে সব উপশাখায় বিভক্ত হয়েছিল তারই বজ্রযানের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্ব এতে বিধৃত। মহাসুখরূপ নির্বাণলাভ- এই হলো চর্যার প্রধান তত্ত্ব। পদকর্তারা কেউ কেউ গুরুবাদী- তন্ত্রমন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন। সাধনতত্ত্বে এই মতপার্থক্য থাকলেও নির্বাণ সম্পর্কে তাদের দ্বিমত নেই। বাস্তব জীবনের জরামরণ ও পূর্বজন্মের বিষচক্র অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ হচ্ছে সিদ্ধাচার্যদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সহজে পৌঁছানোর জন্য গূঢ় তান্ত্রিক আচার-আচরণের সাহায্য গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

চর্যাপদে দার্শনিক তত্ত্বের দিক প্রাধান্য পায়নি, সাধনতত্ত্বের দিকটাই প্রধান্য পেয়েছে। মহাসুখ বা মন্ময় আনন্দলাভের জন্য কোন পন্থা চর্য বা আচরণীয় এবং কোনটি অচর্য বা অনাচরণীয় তা বিনিশ্চয় বা সুনিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা চর্যাপদের লক্ষ্য।

চর্যাপদের সমাজচিত্র

চর্যাপদগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। সমাজচিত্র অংকন এর লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু যেসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে তৎকালীন সমাজের চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। চর্যাপদের মধ্যে সে আমলের জীবনযাত্রার নানা আচারব্যবহার, রীতিনীতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় মিলে।

চর্যাপদে যাদের চিত্র পাওয়া যায় তারা ধর্মক্ষেত্রে বৌদ্ধ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। চর্যাপদের ভাষা, বস্তুবাচক শব্দ, উপমা-উপমিত পদ, পেশা, প্রতিবেশ, তৈজস, ঘরবাড়ি, ব্যবহারসামগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন-জীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত।

সমাজের নিচু স্তরের মানুষের কথা চর্যাপদে প্রতিফলিত হয়েছে। তারা সমাজের অভিজাত মানুষ থেকে দূরে বসবাস করত গ্রামের প্রান্তে, পর্বত গাত্রে কিংবা টিলায়।

↘ ২৮নং চর্যায় :

উষ্ণা উষ্ণা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।

-'উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূরের পুচ্ছ পরিধান করে শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা।' নগরের বাইরে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বাস। ১০নং চর্যায় বলা হয়েছে 'নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ - নগরের বাইরে ডোম্বি তোর কুঁড়ে ঘর। "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী'- টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। ৩৩ নং চর্চায়ও জনবসতির বাইরে বসবাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। কাপালিক, যোগী, ডোম্বী, চণ্ডালী, শবরী, ব্যাধ, তাঁতি, ধুনুরী, শুঁড়ি, মাহুত, নট-নটী, পতিতা প্রভৃতি নিম্নস্তরের মানুষের কথা চর্যায় বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি চর্যায় ব্যাধবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। ব্যাধকর্তৃক হরিণ শিকারের সুন্দর বর্ণনা আছে ভুসুকুর চর্যায় ৬নং পদে :

কাহেরে ঘিনি মেলি আছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস॥
আপণা মাংসে হরিণী বৈরী।
খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরীম॥

নৌকার উৎপ্রেক্ষা ব্যবহৃত হয়েছে অনেক চর্যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা একটি সাধারণ উপমা। ৮, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ ইত্যাদি সংখ্যক চর্যায় নৌকা চালনা, গুন টানা, জল সেচা ইত্যাদির যে বিবরণ আছে তাতে মনে হয় নৌকা বাওয়া এদেশের জীবনে একটি জনপ্রিয় বৃত্তি ছিল।

↘ ডোম্বীদের বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙ্গারি তৈরি করা। অনেকে মদ চোলাই করত। যেমন, ৩নং চর্যায় :

এক সে শুণ্ডিনী ঘরে সান্ধই।
চীঅণ বাকলত বারুণী বান্ধই॥

↘ দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ ও অশান্তির চিত্র চর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। তখনকার জীবন ছিল রিক্ততায় পরিপূর্ণ :

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

৩৩নং চর্যার এই অংশে অনুভব করা যায় যে, সমাজ-সংসার থেকে দূরে, প্রতিবেশীহীন টিলার ওপর ঘর, হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্য সেখানে অতিথি, ব্যাঙের মতো সংসার বেড়েই যাচ্ছে।

দেশে তখন চুরি-ডাকাতির প্রাদুর্ভাব ছিল। 'কানেট চোরে নিল অধরাতী' (চর্যা নং-২)।

সমাজের নৈতিক অবস্থা তখন খুব উন্নত ছিল না। নাগরালি, কামচণ্ডালী, ছিনালী, পতিতা, লম্পট প্রভৃতি রূপক চর্যায় ব্যবহৃত হয়ে সে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

↘ ২নং চর্যায় আছে :

দিবসহি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাউ।
রাতি ভইলে কামরূ জাউ।
-'দিনে বধূ কাকের ভয়ে ভীত আর রাতে কামরূপ চলে যায়।

সমাজের খণ্ড চিত্র চর্যায় বিধৃত হয়েছে। তৎকালীন বাঙালির আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির আভাস চর্যায় সহজেই পাওয়া যায়। একাধিক চর্যায় উল্লেখ থাকায় মনে হয় শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-শালী নিয়ে বাঙালির সংসার গড়ে উঠত।

দাবা খেলা ছিল সে আমলে অবসর বিনোদনের উপায়। মদপান, কর্পূর দিয়ে পান খাওয়া, নাচ গান ইত্যাদি সামাজিক জীবনে প্রচলিত ছিল। গানে নানা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত। চর্যাপদে তৎকালীন জীবনযাত্রার এরকম নানা উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

চর্যাপদের বিষয়বস্তু/সাহিত্যমূল্য

ক) তত্ত্ব/ধর্মমত: চর্যাপদে রূপক-প্রতীক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম মতাদর্শ, জীবন প্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব বিধৃত হয়েছে। ধর্মমতের পাশাপাশি পদগুলোতে তৎকালীন সমাজের জীবন চিত্র ও প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে।

বৌদ্ধ সহজিয়া: একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। বৌদ্ধদের মতে পথের পার্থক্যের কারণে হীনযান ও মহাযান এই দুই শাখায় ধর্মমত বিভক্ত হয়। মহাযানীরা আবার কালচক্রযান ও বজ্রযান নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। বজ্রযান শাখা হতে বৌদ্ধ সহজিয়া সমবাদের উদ্ভব হয়। সহজিয়া ধর্মমতে- যা আমাদের স্বভাবের অনুকূল তাই সহজ। মনুষ্য স্বভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম না করে স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করে যোগপথে আত্মোপলব্ধির যে চেষ্টা তাই হলো ধর্মের ক্ষেত্রে সহজপথ। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের সাধনসঙ্গীত চর্যাপদ। সহজিয়াগণ তাত্ত্বিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে ধর্মসাধনায় দেহকে বাদ দেননি, বরং তারা মনে করেন কায়িক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক সকল পথই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও চর্যাপদে নাথ ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়।

খ) **সমাজ জীবন / দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিত্রায়ন / লোকজীবন :** চর্যাপদের মধ্যে সে আমলের জীবনযাত্রায় নানা আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় মেলে। সমাজের অদৃশ্য ঢোম, কামলি, শবর, চণ্ডাল, শুঁড়ি, ব্যাধ, মাঝি, তাঁতি, ধুনুরি, কাঠুরে, জেলে, পতিতা প্রভৃতি পেশাজীবী মানুষেরও পরিচয় রয়েছে পদসমূহে।

গ) **প্রকৃতির রূপ :** চর্যাপদে প্রকৃতির অপরূপ রূপেরও বর্ণনা রয়েছে। শবরপা রচিত ২৮নং পদে বর্ণনা রয়েছে। পর্বতশীর্ষে লীলাময়ী সবরী বালিকা, আরণ্য সৌন্দর্য তার অঙ্গে, তার খোঁপায় গোঁজা শিখিপুচ্ছ, বুকের ওপর দুলে দুলে উঠছে গুঞ্জার মালা। তার কানের কুণ্ডলে সকালের রোদ ঝিকমিকিয়ে উঠছে। তাকে দেখে আচার্য শবরপা সব ভুলে যান, নিজের স্ত্রীকেই পরস্ত্রী মনে করে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। পত্রপুষ্পে গাছগুলো ভরে উঠেছে। ৫০ সংখ্যক চর্যাতেও এমনি একটি সুন্দর চিত্র মিলে। শবরের বাড়ির চারদিকে কার্পাস ফুল ফুটেছে। রাতের আকাশে জ্যোৎস্না নেমেছে, কঙ্গুচিনা পেকেছে, শবর-শবরী তা থেকে প্রস্তুত মদ পান করে মাতাল হলো।

চর্যাপদের ছন্দ

চর্যাপদের ছন্দ সম্পর্কে ভিন্ন মত বিদ্যমান। কারও মতে, চর্যাপদের চার মাত্রার চাল ভিত্তিক ঘোল মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ, কারও মতে পজ্ঝটিকা ছন্দ, কারও মতে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ রচনায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুকরণ, কেউবা পয়ার-ত্রিপদী তথা অক্ষরবৃত্তের প্রবণতা লক্ষ করেছেন।

চর্যাপদের ছন্দে সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দের প্রভাব রয়েছে। পজ্ঝটিকা ছন্দের প্রতি চরণ ষোল মাত্রার, চরণে চার পর্ব, চার মাত্রা। আবার শৌরসেনী প্রাকৃত প্রভাবিত মাত্রাপ্রধান পাদাকুলক ছন্দের সঙ্গেও চর্যার ছন্দের মিল রয়েছে। পাদাকুলক ছন্দের চরণও ষোল মাত্রার, প্রতি চরণে চার পর্ব, প্রতি পর্বে চার মাত্রা। তবে এ ছন্দের হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের মাত্রাগণনার পদ্ধতি চর্যাপদে অনুসৃত হয়নি। চর্যাপদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত রীতিতে গঠিত হলেও মাত্রাবৃত্তের বর্তমান সুনির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি এতে মানা হয়নি। আসলে চর্যাপদ গান হিসেবে গীত, কবিতা হিসেবে রচিত নয়। সেজন্য মাত্রা বা অক্ষরের হিসাবে চর্যাপদ ত্রুটিপূর্ণ।

ড. সুকুমার সেনের মতে, "চর্যাগীতির ছন্দ একদিকে অবহট্‌ঠ ছন্দ আর একদিকে বিশুদ্ধ বাংলা ছন্দ- দুইয়ের মাঝামাঝি।" অন্ত্যানুপ্রাস চর্যাপদের সর্বত্র বিদ্যমান।

চর্যাপদে প্রবাদবাক্য

চর্যাপদে মোট প্রবাদ বাক্য ৬টি। প্রবাদ বাক্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি হলো-

১) আপনা মাংসে হরিণা বৈরী
২) দুহিল দুধু নাহি বেন্টে সামাঅ।

দোহাকোষ

শৌরসেনী অপভ্রংশে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা রচিত দোহাকোষে বজ্রযান ও সহজযান মতাবলম্বী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধনভজন ও আচার-আচরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সরহপাদ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষ দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এ সব গ্রন্থের পদগুলো যে ধর্মতত্ত্ব, সাধনভজন ও মানসিক পরিবেশে রচিত তা চর্যাপদের সমপর্যায়ের বলে মনে করা হয়।

কৃষ্ণাচার্যপাদের দোহাকোষ:
এক্ক ণ বিজ্জই মন্ত ণ তন্ত
ণিঅ ঘরণি লই কেলি করন্ত॥

লোকসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অংশ লোকসাহিত্য। বৈচিত্র্য-ব্যাপকতায় এবং জীবনের সঙ্গে একাত্মতায় উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে তা যুগ যুগ ধরে সমাদৃত। লোকসাহিত্য বলতে জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গল্প-কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি বোঝানো হয়। সাধারণত কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই। অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যগুণসম্পন্ন সৃষ্টি প্রধানত মৌলিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হয় তাকে লোকসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টি করার যে প্রবণতা চিরন্তনভাবে মানব মনে বিদ্যমান থাকে তা-ই লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত বা বিবেচিত। জনপ্রিয় প্রবাদ-প্রবচনগুলো যে সর্বজনগ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১) সহজ অর্থদোতকতা: প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত হয় বলে প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ সহজেই বোঝা যায়।
২) ভাবসংহতি: অনেক শব্দ প্রয়োগ করে যে ভাব প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে, প্রবাদে তা অল্পকথায় সংহতভাবে প্রকাশিত হয়।
৩) সরল প্রকাশভঙ্গি : প্রবাদের সরল প্রকাশভঙ্গি সহজেই শ্রোতার মনে গেঁথে যায়। প্রবাদের মধ্যে কিছু স্মৃতি-সহায়ক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- ক. ছন্দ, খ. অনুপ্রাস ও গ. অন্ত্যমিল।
৪) শোভন ভাব প্রকাশ: রুচিবান মানুষের কাছে শোভন পন্থায় মানবচরিত্র সম্পর্কে সতর্ক সংবাদ এবং হিতকর পরামর্শ ও যথাযথ উপদেশ প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে।
৫) অভিজ্ঞতার সারাৎসার: প্রবাদের আকর্ষণ ও তাৎপর্যের মূলে রয়েছে সমৃদ্ধ জীবন অভিজ্ঞতার সরল ও সংহতি প্রকাশ।
৬) অর্থব্যঞ্জকতা: প্রবাদের রয়েছে গভীর অর্থব্যঞ্জকতা বা স্বল্প শব্দ প্রয়োগে ভাব প্রকাশের আশ্চর্য ক্ষমতা।
৭) সর্বজনগ্রাহ্যতা : প্রবাদের সাধারণত এমন অভিজ্ঞতাই বাণীরূপ পায়, যা সচরাচর সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে বাইরে নয়।

ধাঁধা

ধাঁধার একটি বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দ। ছন্দ মিলিয়ে ধাঁধা ধরা হয়। আর ধাঁধার উত্তর হয় এক বা দুই শব্দে। একেক ধাঁধার এক এক উত্তর। কোনো ধাঁধা ধরা হয় ফল নিয়ে, আবার কোনো ধাঁধায় লুকায়িত থাকে প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম। কোনো ধাঁধা অক্ষর নিয়ে। কোনো ধাঁধার থাকে অঙ্কের হিসাব। কোনো ধাঁধায় লুকায়িত থাকে মানুষের সম্পর্ক। আগের দিনে মানুষ মুখে মুখেই ধাঁধা তৈরি করত। আর মানুষের মুখে মুখেই তা টিকে থাকত। একজন মানুষ অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনেই ধাঁধা মনে রাখত। যেমন : দাদা-দাদি থেকে মা-বাবা ধাঁধা শুনেছে, আবার মা-বাবা থেকে শুনেছে ছেলে-মেয়েরা। মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এসব ধাঁধা তৈরি হতো।

ডাক ও খনার বচন

ডাক ও খনার বচনকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এগুলো যে রূপে সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন লিখিত নিদর্শন বর্তমান নেই। তা মুখে মুখে প্রচলিত থাকার ফলে তার ভাষাও হয়ে পড়েছে আধুনিক যুগের উপযোগী। বিষয় হিসেবে ডাক ও খনার বচন পুরানো এবং ছড়া জাতীয় নমুনাকে লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ছড়া জাতীয় এসব রচনায় এদেশের আবহাওয়া ও কৃষি সম্পর্কিত বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এসবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে নীতিকথা ও বহুদর্শী উপদেশ। ডাক নামে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন কিনা জানা যায়নি। সাধারণত প্রাচীন আমলের এক শ্রেণির বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধককে ডাক বলা হত। প্রাচীন যুগের ফলিত জ্যোতিষ ও কৃষি-বিষয়ক অভিজ্ঞতা এসব বচনের মধ্যে ছড়ার আকারে প্রচলিত হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন রচনার কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বিবেচনা করেছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এর কতকলোকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলে ধারণা করেছেন। ডাকের বচন ও খনার বচনের মধ্যে বিষয়গত ঐক্য বিদ্যমান।

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, "নীতিবাক্য, বহুদর্শী উপদেশ, আবহাওয়া ও কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে ছড়া অবহট্টঠেও প্রচলিত ছিল, এগুলি বরাবর চলে আসছে কালোচিত ভাষা-পরিবর্তন নিয়ে।

ডাক ও খনার বচন প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আধুনিক যুগে এসেছে। সেজন্য এর ভাষায় প্রাচীনত্ব অবশিষ্ট নেই।

↘ ডাকের বচন:

নিয়ড় লোখরী দূরে যায়।
পথিক দেখিয়া আউড়ে চায়॥
পর সম্ভাষে বাটে থিকে।
ডাকে বলে এ নারী ঘরে না টিকে॥

↘ খনার বচন:

দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥
কাতিকের উনজলে।
খনা বলে দুন ফলে॥

ডাক ও খনার বচনের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য থাকলেও ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের কথা ও মানব-চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে। খনার বচনে কৃষি ও আবহাওয়ার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ডাক ও খনার ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। খনা ছিলেন জ্যোতির্বিদ।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'ডাক নামক জনৈক গোপ ডাকের বচন প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে।'